:: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অজিত দত্তের স্থান ::

অজিত দত্তের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৭ টি। ছড়ার বই ১ টি। শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ এবং রঙ্গরচনা গ্রন্থ ২ টি। অসম প্রবন্ধ ও একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' এই তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা। এছাড়াও তিনি অজস্র কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে বলা যায় তিরিশের দশকের কবি।

প্রথম যৌবনে, ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' তাঁকে এযাবৎ কিছুটা হলেও স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। এবং জীবনানন্দের বনলতা সেন বা বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতীর মত তাঁরও কবিতার নায়িকার নাম যে মালতী তা আমরা জানি। 'কুসুমের মাস' প্রধানত প্রেমের কবিতার বই। এবং সেই প্রেমের নায়িকা মালতী। অজিত দত্ত যে রোমান্টিক সুর ও আবহ আজ তাঁর প্রথম গ্রন্থে সৃষ্টি করেছিলেন - পরবর্তী প্রায় সব কটি গ্রন্থে তাকেই লালন করেছেন।

এদেশে তিরিশের দশকে একদল তরুণ কবি মোহিতলাল - যতীন্দ্রনাথ নজরুলের প্রভাব স্বীকার করে রবীন্দ্র কাব্যাদর্শের প্রচলিত পথ ত্যাগ করে নতুন পথে কবিতা লিখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বস্তুত এঁরা কেউই রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন না। জীবনানন্দ দাশ - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত - বুদ্ধদেব বসু - প্রেমেন্দ্র মিত্র অমিয়চক্রবর্তী - বিষ্ণু দে এবং এঁদেরই সতীর্থ অজিত দত্ত বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেবার সংকল্পে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে নিজেদের বিশ্বাস ও মূল্য বোধগুলি ঠিক ঠিক তাঁরা মিলিয়ে নিতে পারেন নি। তাছাড়া সে যুগের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা গুলোও তখন আমূল পাল্টে গিয়েছে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় মানুষ তখন আর পুরোণ, শাশ্বত মূল্যবোধ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে আস্থা রাখতে পারছিল না। তাই নতুন যুগের-সময়ের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ, ন্যায় নীতি ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় কেন্দ্র বিন্দুতে তাঁরা সজাগ পদচারণা রচনা করতে চেয়েছেন। শিল্পী বা কবি সাহিত্যিকরাও এগুলিকে প্রবলভাবে তাঁদের রচনা কর্মে আকর্ষণ করে সমকালের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের নানাভাবে ও উপায়ে যুক্ত করেছেন। প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছেন।

নানা দল ও গোষ্ঠী তে তখন সাহিত্য কেন্দ্র বিভক্ত। একদিকে 'প্রগতি লেখক সংঘ' অন্য দিকে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'। উভয় দল বা গোষ্ঠিই সমকালীন জীবনের দলিল রচনা করতে তখন সচেষ্ট। সে যাই হোক আমাদের আলোচ্য কবি অজিত দত্ত কবিতা রচনার শুরুতে এই আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকলেও মানসিক গঠনের জন্য তিনি অচিরে ভিন্ন মেরুতে

চলে আসেন। এবং সেক্ষেত্রে তিনি কোন গোষ্ঠিরই অন্তর্গত ছিলেন না। তাঁর কাব্য সাধনার পথ হলো সব অর্থে একক।

'কুসুমের মাসের' কবির প্রেম স্বপ্নকল্পনা, অস্থিরতার ইতিহাস এবং রোমান্টিকতা পূর্ণতা পেয়েছে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পাতালকন্যা'তে। প্রত্যেক কবির তার নিজস্ব ভাবজগত ও কল্পনা পদ্ধতি থাকে। হৃদয় ও মননের যুগ্ম রসায়নে তাই তাকে অন্যের থেকে আলাদা করে আমাদের চিনিয়ে দেয়। অজিত দত্তের কবিতার একটি অন্যতম রীতি বা পদ্ধতি দূরভিসারের প্রতি আকর্ষণ এবং রূপকথাধর্মী রোমান্টিকতা। 'পাতালকন্যা'র 'পশাবতী' কবিতাটি স্মরণীয়। আমরা তাঁর কাব্য আলোচনা সূত্রে সেকথা বলেছি। বাস্তবের কোন পরিস্থিতিকে - সত্যকে তিনি রূপকথার দেশে পাঠিয়ে যেন পরখ করে দেখতে চেয়েছেন। 'কুসুমের মাস' এর সেই আন্তরিক প্রণয় ও সেই আর্তি 'পাতালকন্যা' কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'পুনর্নবা' গ্রন্থে ঈষৎ ভিন্ন ও আরো পরিণত কণ্ঠস্বর। প্রেমের সেই মায়াবী স্বপ্নজাল রচনাতেই তার এখন চলছে না। হারানো সেই মহিমময় মাধুর্যটুকু তিনি দার্শনিক সত্তায় বিন্যস্ত করেছেন। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতো বাচন ভঙ্গি সেই পরিচিত স্নিগ্ধতায় তাঁকেই নতুন করে চিনিয়ে দেয়। জীবন যে শুধু স্বপ্ন নয়, সেখানে যে বাস্তবের রূঢ় ভিত্তি আছে একথার প্রমাণ এই গ্রন্থের কবিতায় রয়েছে। 'ছায়ার আল্পনা'কে আমরা বলেছি এককথায় ঘরে ফেরার কাব্য। কবি যৌবনের সেই মায়াবী জীবনে ফিরতে চান। কবির দিন শেষের বিষন্ন চেতনা এর শরীরের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। এতে তাঁর ব্যক্তিগত বিস্তীর্ণ জীবনের অসংখ্য স্মৃতিরা ভিড় করে এসেছে। সেই স্বপ্নময় মায়াবী হাতছানি তাঁকে পুনরায় তাড়া করে ফিরেছে। 'জানালা' কাব্যগ্রন্থ আমাদের বিবেচনায় জীবনের প্রাক্ সন্ধ্যালগ্নে উপস্থিত প্রৌঢ় কবির দিনলিপি। এখানে পৃথিবীর রহস্যময়তায় তিনি উৎকর্ণ। এবং হৃত যৌবন কবির অসীম বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা সবকিছুকে নতুন করে আস্বাদন করার। প্রতীকের আশ্রয়ে তিনি কবিতাগুলি রচনা করেছেন। আর আগের সেই রূপকথার মোহমুগ্ধতা নয় - এতে আছে মোহভঙ্গের করুণ আর্তনাদ। অনুবাদ কবিতা নিয়ে প্রকাশিত অজিত দত্তের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'শাদামেঘ কালোপাহাড়' - এ দীর্ঘপথ পরিক্রমা সেরে কবি এখন আত্মস্থ। জীবনের সব আয়োজন সব অর্থে মেনে নেবার এক স্থিতধী প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা এতে আছে। এককথায় এই প্রতীক্ষা ও জাগরণের, আবিষ্কারের, আত্মজিজ্ঞাসার। এবং এই গ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁকে আধুনিক কবিদের স্বক্ষেত্রে অনেকটাই নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে। কাব্যপ্রকরণ ও যুগোচিত সংস্কারবোধে তিনি অনেক বেশী অনুবর্তী কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন।

কবির ভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকরণের কবিতা 'নষ্টচাঁদ' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবিতাগুলিতে দ্বিতীয় মহাসমর-এর ভাবনা ও চেতনা অস্থির পরিস্থিতি প্রকাশিত হয়েছে নানাভাবে - নানাউপায়ে। তার বিস্তারিত আলোচনা কাব্য আলোচনা সূত্রে ও অন্যত্র করেছি।

অজিত দত্ত অনেক সনেট রচনা করেছেন। এবং এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব ও প্রতিভার সাফল্য কি আশাতীত এবং কতটা দীপ্ত ও উচ্চস্তরের সে আলোচনা আমরা করেছি। এছাড়া ছড়া ও বাঙ্গ কবিতা রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

অজিত দত্ত গল্প উপন্যাস রচনা না করলেও রম্যরচনা এবং প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি তাঁর গদ্যের গঠন ও প্রকাশভঙ্গি অথবা প্রমাণ, বিশ্লেষণ নিখুঁত ও যথাযথ। মতামত স্পষ্ট ও সোচ্চারমুক্ত হওয়ায় পাঠককে বিতর্ক - বিবাদের মুখে পড়তে হয় না। মতাদর্শে কোনভাবে একদেশদর্শিতা নেই। সুতরাং সুচিন্তিত গদ্যকর্মে তা সে প্রবন্ধই হোক অথবা সরস রম্যসাহিত্যই হোক উভয় ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট মননের স্বাক্ষর রেখেছেন।

আমরা আগেই বলেছি অজিত দত্ত প্রধানত কবি। সুতরাং তাঁর যাবতীয় রচনা কর্মেই কবি-জনোচিত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও শিল্পী সুলভ আত্মবিশ্বাস সক্রিয় ছিল। তিনি কোন ক্ষেত্রেই নিজের বিশ্বাস ও চেতনার বাইরে অন্যকোন মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি কর্মে অগ্রসর হন নি। জীবনের সুস্থিতি রক্ষার, শিল্প ও সাহিত্যের সুস্থিতি রক্ষার নীরব প্রয়াস অনায়াসে তাঁর লেখায় আমরা খুঁজে পাব। এক কথায় বিশুদ্ধ কাব্য রচনার স্পৃহা তিনি যে লালন করেছেন তা তাঁর কবিতা পড়লে ধরা যাবে।

তিরিশের দশকে আবির্ভূত অন্যান্য কবিদের কাব্যে যেমন আধুনিক কবিতার প্রক্রিয়া প্রকরণের জোয়ার লক্ষ করা যায়, তাঁর কাব্যে ঠিক সেভাবে ও পরিমাণে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ গুলো অনায়াস লক্ষণীয় নয়। অবশ্য তাঁর কাব্যে তাই বলে আধুনিক সময়ের সমস্যাগুলো নেই তা নয়। আছে - অনেকভাবেই আছে, তবে প্রকাশ ভঙ্গি ও অন্য অন্যান্য কারণে তাঁর কবিতাকে এককথায় আধুনিক শিরোপা দেওয়া সমীচীন নয়। এর আলোচনা আমরা আগেই পৃথক ভাবে উপস্থাপিত করেছি।

রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে, তাঁর বিশ্বাসের জগতের প্রায় বিপরীত মেরুতে উপনীত হয়ে কবিতা রচনার যে প্রয়াস তিরিশের কবিদের আকৃষ্ট ও উত্তান করেছিল, কবি অজিত দত্ত তার সঙ্গে প্রথম যৌবনে নিজেকে সক্রিয় ভাবে যুক্ত রেখেও পরবর্তীকালে সেখান থেকে সরে এসে নিজের হৃদয়ের মননের চাহিদা অনুসরণে কবিতা রচনা করেছেন। সমকালের তাৎক্ষণিক চাহিদার কোন প্রতিফলন এখানে নেই অথবা উৎকট জীবনদর্শনের বিন্যাস ও রচনা করে তিনি পাঠককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতে চান নি। এককথায় কবিতা রচনার বিশুদ্ধতম প্রয়াসী হিসেবে তাঁকে দেখাই যুক্তি সঙ্গত। তাঁর কবিতা আমাদের তাই কোনভাবেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দাঁড় করায় না। অথবা আমাদের প্রাণের স্বচ্ছন্দ আরামে ব্যাঘাত ঘটায় না। সমকালে অন্যান্য প্রায় সকল কবিরা যখন বিভিন্ন বিদেশী কবিদের দর্শনের অনুসরণে নিজেদের সমুখ ও আধুনিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে ব্যস্ত কবি অজিত দত্ত তখন আমাদের দেশের প্রাচীন রূপকথার জগতে মতবিরত আধুনিক জীবনের থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে চলেছেন। তিনিই লিখতে পেরেছেন —

' কুমার শুনেছে রূপকথা;
সাপের নিশ্বাসে যিয় পাতালের অবশ প্রাসাদে ক
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
- নীল স্লানতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন?

এমন অদ্ভুত রূপ আছে কোন্ রাজকুমারীর?
এমন চোখের পাতা (কুমার দেখেছে স্বপ্ন তা'র)
পৃথিবীতে কার আছে? কার আছে এমন শরীর?
এমন পুরান ঠোঁট আছে কোন্ সম্রাট - কন্যার?
আর কোন্ কন্যা আছে যার খোঁজ কেহ নাহি জানে,
কুমার একেলা যাবে - পণ তা'র - যাহার সন্ধান;
তারি কাছে গেছে কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন? ''

(পাতালকন্যা)

এই অতীত কাহিনী নির্ভরতার ধরণ আমরা তাঁরই সমকালের জীবনানন্দের রচনাতেও প্রত্যক্ষ করি। বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়ও বিরল নয়। তবে অজিত দত্তের কবিতায় এসবের ব্যবহার প্রচুর।

আসলে অজিত দত্ত গীতিপ্রাণ কবি। তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই অনেক আশ্চর্য সুন্দর লিরিক কবিতা আছে। সেগুলিতে আবেগের উচ্চারণ বাড়াবাড়ি নেই। শান্ত কোমল পদাবলীর, মতই তার স্বাদ মধুর। আমাদের আপ্লুত করে — ভাবায়। যেমন যেখানে তিনি লেখেন —

'' আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে — পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত,
সে — আকাশ তোমার অন্তর,
মানসী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।। ''

(একটি কবিতার টুকরো)

তখন বোঝা যায় কী অসীম ঐশ্বর্য এই লিরিকের শরীরে। কবির উচ্ছ্বাস কত সংযত আবেগে ব্যক্ত অথচ সেই স্বাক্ষর কত আশ্চর্য ভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা বা ভাবানুষঙ্গ, রীতি প্রকরণ, বাস্তবতা রোমান্টিকতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই তিরিশের দশকে আবির্ভূত কবিদের সঙ্গে পূর্ববর্তী কবিদের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অজিত দত্তর কবিতায়ও সেই পার্থক্য চিহ্ন সুস্পষ্ট। বস্তুত আধুনিক কবিদের মতই অনুভূতি ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে আধুনিকতার স্বাক্ষর বহন করেও অজিত দত্তর কবিতা রোমান্টিক কল্পনা প্রবণতা ও অন্যবিধ বৈশিষ্ট্যে আকীর্ণ। এ তাঁর মানস গঠনের ফল। একইসঙ্গে বর্তমান জীবন জটিলতার, আবর্তের ভিতর রোমান্টিক অতীতের স্মৃতিকে এঁরা ধরেছেন। অজিত দত্তর কবিতা এই প্রকারের রোমান্টিক। বর্তমানের বিক্ষুব্ধ জীবন প্রবাহে অস্থির কবি কখনো কখনো বা অতীত মুখীন হয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। যে সমস্যা তাঁকে বিচলিত ও অস্থির করেছে তাকে অস্বীকার করে নয়, তার অন্তর্গত হয়ে তাকেই রোমান্টিক কল্পনা সৌন্দর্যে মন্ডিত করেছেন। বাস্তব ও রোমান্টিক ধারার সমূহ লক্ষণগুলি যুক্তভাবে সমীকৃত ও আত্মীকৃত হয়েছে তাঁর কাব্যে। জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক উপভোগের ভিতর দিয়ে তাঁর রোমান্টিক সত্তা বিকাশ লাভ করেছে বলা যেতে পারে।

সুতরাং পাশ্চাত্ত রীতির আদলে বাংলা কবিতায় যে পালাবদল আমরা তিরিশের দশকের কবিদের কাব্যে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করি, কবি অজিত দত্ত সেকালে সেই নতুন রীতির কাব্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেও স্বভাবত

স্বতন্ত্র থেকেছেন। তিনি উদ্দাম চলতি স্রোতের বাইরেই নিজেকে প্রয়াসভর রেখেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিরিশের বিশিষ্ট কবিদের একজন বলে তাকে বিবেচনা করা সমীচীন। সনেট রচনায়, ছড়া ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি যে দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতেই বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট। এ ছাড়া যথার্থ ও উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব শক্তির পরিচয় তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থেও আমরা পাই। তাঁর গদ্য প্রবন্ধ ও রম্যরচনাগুলিও সূক্ষ্ম মননের স্বাক্ষর বহন করে। প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে কবি - প্রাবন্ধিক অজিত দত্ত স্বাতন্ত্র্যভাষী রোমান্টিক শিল্প স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হয় না।